এই লেখাটি 'মনভুবন' এর ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

শিশু প্রতিপালন পদ্ধতি ও শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য

একটি শিশু যখন পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয় সে থাকে ভীষণ অসহায় এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল। মা,বাবা, ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন বা তাদের অনুপস্থিতিতে আশেপাশের মানুষেরা আদর, স্নেহ, ভালবাসা ও শাসন দিয়ে শিশুটিকে প্রতিপালন করতে থাকে। সময়ের সাথে সাথে শিশুটি যখন বড় হতে থাকে তখন তার যে শুধু শারীরিক পরিবর্তনই হয় তা কিন্তু নয় বরঞ্চ তার চিন্তন, আবেগ বা অনুভূতি ও আচরণের বিকাশ ও পরিবর্তন হতে থাকে। আশেপাশের মানুষজনের সাথে তার সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে এবং পরিবেশ থেকে নানা ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে ও অনেক কিছু শিখতে থাকে। একটি শিশুর শৈশবকালে বাবা-মা বা অন্যান্য অভিভাবকদের আচরণ বা প্রতিপালন পদ্ধতি শিশুটির শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিরাট ও সুদূরপ্রসারী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলতে পারে। তবে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, পরিবেশই একজন ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য ও আচার-আচরণের একমাত্র নির্ধারক তা নয় বরঞ্চ আশেপাশের পরিবেশ বা বিভিন্ন ঘটনাকে একজন ব্যক্তি কিভাবে প্রত্যক্ষণ করছে বা দেখছে তার উপরও নির্ভর করে তার মানসিক স্বাস্থ্য, ভাল লাগা-খারাপ লাগা এবং তার আচার-আচরণ ও কার্যকলাপ।

> **একটি শিশুর শৈশবকালে বাবা-মা বা অন্যান্য অভিভাবকদের আচরণ বা প্রতিপালন পদ্ধতি শিশুটির শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিরাট ও সুদূরপ্রসারী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলতে পারে**

উদাহরণ-১ ঃ রহিম (ছদ্ম নাম) একজন অত্যন্ত মেধাবী ২১/২২ বছরের ছেলে। সে মফস্বল শহরে পড়েও এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষায় অত্যন্ত ভাল ফলাফল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে আকাঙ্খিত ও নাম করা বিভাগে ভর্তি হবার সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু তার পক্ষে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছেনা বলে বিষন্নতায় ভুগছে কারণ এ বিভাগে তত্ত্বীয় পড়াশোনার পাশাপাশি অনেক ব্যবহারিক কাজ করতে হয় যার জন্য নিজ দায়িত্বে বিভিন্ন জায়গায় ছোটাছুটি করতে হয়, মালামাল বা জিনিস পত্র সংগ্রহ বা ক্রয় করতে হয় এবং প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় যা কিনা তার পক্ষে করা সম্ভব নয় । ক্লাসের বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীরা যেখানে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য সহযোগীতা করার মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে সামাজিক দক্ষতার অভাবের কারণে রহিম অন্যদের সাথে সহজ ভাবে মিশতে পারছে না এবং সে ভাবে উপকৃত হতে পারছে না এবং সময়মত কার্যসম্পাদন করতে পারছে না । শৈশবকালের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় যে, তার বাবা-মা তার চাহিদা পূরনের ব্যাপারে যতখানি তৎপর ছিলেন ও ইচ্ছা অনিচ্ছাকে যতখানি প্রাধান্য দিয়েছেন তার আচার আচরণর উপর সেভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারেন নি এবং লেখাপড়ার পাশাপাশি দায়িত্ব নিয়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করার ব্যাপারে এবং সামাজিক সম্পর্ক তৈরীর ব্যাপারে সেরূপ চাহিদা আরোপ করতে পারেন নি। ফলে সে তার ইচ্ছামত জীবনযাপন করার সুযোগ পেয়েছে এবং দায়িত্বগ্রহণ করা ও পরিশ্রম করাটাকে এড়িয়ে চলতে পেরেছে।

ব্যাখ্যা ঃ উপরের উদাহরণ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সন্তানের ভাল-মন্দ সব চাহিদা মেটাতে হবে তা ঠিক নয় বরঞ্চ তাদেরকে সাহায্য করতে হবে যাতে করে ভাল ও মন্দের মধ্যে বিভেদ করতে পারে এবং ভবিষ্যত জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী ও কাজের অনুশীলন শৈশব কাল থেকেই যেন করতে থাকে সে ব্যাপারে বাবা মার তৎপর থাকা প্রয়োজন ।

উদাহরণ-২ ঃ এবার দেখা যাক ২৫/২৬ বছরের তরুন করিমের (ছদ্ম নাম) জীবনে কি ঘটেছে । সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাশ করার পর চাকরি পাবার জন্য বিভিন্ন জায়গায় চেষ্টা চালাচ্ছে । তার স্বপ্ন হল সে পড়াশোনা শেষ করে চাকরি করবে। কিন্তু সমস্যা হল যখনই সে মৌখিক পরীক্ষায় পরীক্ষকদের সামনে উপস্থিত হয় তখনই সে এত নার্ভাস বোধ করে যে, সে যেন নানা জিনিস ভুলে যায় এবং নিজেকে যথাযথ ভাবে উপস্থাপন করতে পারে না। শৈশবের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, তার বাবা-মার সে ছিল আদরের একমাত্র ছেলে সন্তান এবং বাবা-মা তার নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে এত বেশী সক্রিয় ছিল যে বিপদে পড়তে পারে বা ব্যাথা/কষ্ট পেতে পারে বা ভুল করার কারণে ব্যর্থতার অনুভূতি আসতে পারে এসব চিন্তা করে কোন কাজে অংশগ্রহণ করাকে উৎসাহিত করতে পারতেন না এবং কোন কাজ করতে গেলে সে এ কাজটি করতে পারবে না এ বলে তাকে ঐ কাজ করা থেকে বিরত রাখতেন। এতে করে রহিম হীনমন্যতায় ভুগত এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে কোন কাজ করার উদ্যোগ নিতে পারতো না । প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পরও কোন কাজ করার দরকার পড়লে কাজটি সফল ভাবে করতে পারবে কিনা এ সন্দেহ মনে কাজ করতে থাকে এবং নার্ভাস বোধ করতে থাকে ও কাজটি শুরু করার ক্ষেত্রে অযথাই বিলম্ব ঘটাতে থাকে এবং সময় মত কার্য সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয় ।

> **আত্মবিশ্বাসের ঘাটতির কারনে সামাজিক পরিস্থিতিতে অন্যের দ্বারা অবমূল্যায়িত হবার ভয় কাজ করার কারণে অন্যদের সাথে মিশতে এবং অনেক মানুষের সামনে নিজের বক্তব্যকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে দুঃশ্চিন্তার উদ্রেক ঘটতে পারে**

ব্যাখ্যা ঃ উপরের উদাহরণ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, বাবা-মার অতিরিক্ত রক্ষণশীলতার কারণে ছোট বেলায় কাজ শেখার ও করার সুযোগ না পেলে এবং অন্যদের সাথে মেশার ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ না পেলে আত্মমর্যাদা বোধ ও আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি ঘটে এবং কোন কাজ করতে গেলে দুঃশ্চিন্তার ও ভয়ের উদ্রেক ঘটতে পারে এবং নার্ভাস বোধ করতে পারে এবং ধীর স্থির ভাবে সম্পূর্ণ মনোযোগের সাথে সফল ভাবে কাজটি করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে পড়তে পারে। আত্মবিশ্বাসের ঘাটতির কারণে সামাজিক পরিস্থিতিতে অন্যের দ্বারা অবমূল্যায়িত হবার ভয় কাজ করার কারণে অন্যদের সাথে মিশতে এবং অনেক মানুষের সামনে নিজের বক্তব্যকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে দুঃশ্চিন্তার উদ্রেক ঘটতে পারে ।

উদাহরণ-৩ ঃ এবার সেলিনা (৩০) এর জীবনের দিকে আলোকপাত করা যাক। সে হীনমন্যতায় ভুগতো এবং আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি থাকায় সে পড়াশোনা করতে গেলে বা কোন কিছু শিখতে গেলে বা কোন কাজ করতে গেলে তা সফল ভাবে করতে পারবে কিনা এ চিন্তা করে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়তো এবং কোন কাজে যেন আগ্রহ পেত না।

আবার সামাজিক দক্ষতার ঘাটতির কারণে অন্যদের সাথে মিশতে গেলেও সে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ত এবং সহজে অন্যদের সাথে সুন্দর সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারত না, উপরন্তু মানসিক কষ্টে থাকার কারণে,কেউ কোন সমালোচনা করলে তার নিজেকে খুব ছোট মনে হত এবং প্রায়ই তার পক্ষে রাগ নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টকর ব্যাপার হয়ে পড়ত।

সেলিনার ভেতরে মানসিক কষ্ট কাজ করে যে, সে মায়ের আদর ভালোবাসা পায় নি । তার মার অল্প বয়সে বিয়ে হওয়াতে নিজের পড়াশোনা নিয়ে এবং অন্যান্য কাজ নিয়ে বেশী ব্যস্ত থাকতেন এবং মেয়ের আবেগ অনুভূতির দিকে লক্ষ্য করা এবং তার বিভিন্ন সমস্যার সময়ে মনোযোগের সাথে কথা শোনা ,পছন্দ বা অপছন্দকে গুরুত্ব দেয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহনের সময়ে তার মতামতের গুরুত্ব দেয়া, প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করার জন্য বা সমস্যা সমাধানের জন্য সাপোর্ট দেয়া এবং আবেগীয় সম্পর্ক গড়ে তোলা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে নি । শুধু তাই নয় সেলিনার সুন্দর ও সুখী জীবন যাপনের জন্য তার বাবা-মা প্রয়োজনীয় কাজ করার ব্যাপারে চাহিদা আরোপ করতে পারে নি এবং এ লক্ষ্যে সঠিক দিক নির্দেশনা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা দিতেও সক্ষম হন নি। এসব কারণে তার ভিতরে বঞ্চিত হবার অনুভূতি, নিরাপত্তাহীনতা ও হতাশার অনুভূতি কাজ করত এবং সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগত।

ব্যাখ্যা ঃ উপরের উদাহরণ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, বাবা-মা বা অন্যান্য অভিভাবকদের অমনোযোগীতা বা অবহেলা বা উপেক্ষা বা তাচ্ছিল্য সন্তানের জীবনে করুন পরিণতি ডেকে আনতে পারে। এ ক্ষেত্রে সন্তানের আবেগীয় চাহিদাগুলো পূরণ করার ব্যাপারে তারা থাকে অযত্নশীল , ভাল কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেয়া বা প্রশিক্ষণ দেয়া বা এ ব্যাপারে চাহিদা আরোপ করাও তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠে না । অন্যকথায় স্নেহ-ভালোবাসার বন্ধন যেমন থাকে না আবার সন্তানের কাছে কোন প্রত্যাশা বা তাদের আচরণের উপর নিয়ন্ত্রণও তেমন থাকে না। অর্থাৎ সন্তানের সাথে কোন চাওয়া- পাওয়া বা দেওয়ার যেন কোন সম্পর্কই থাকে না। এতে করে সন্তান একাকীত্ববোধ করে এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দুঃশ্চিন্তা বা ভয়ের উদ্রেক হতে পারে ।

উদাহরণ-৪ ঃ এবার দেখা যাক রিতার (ছদ্ম নাম) জীবনে কি ঘটেছে । যদিও সে একটি ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল একটি বিভাগে পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছে তার পরেও সে নিজেকে খুব ছোট এবং একা মনে করত এবং অপরাধবোধে ভুগত। কারো সাথে একটু পরিচয় হলে তার উপরে নির্ভরশীলতা কাজ করত এবং তাদের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করতে পারতো না । জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুখী হতে পারবে এ আত্মবিশ্বাস তার ছিল না বলে সে হতাশায় ভুগত এমনকি আত্মহত্যার মাধ্যমে জীবন নাশের চেষ্টাও করতো। এসব কারনে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করা বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ত। রিতার বাবা-মা কিভাবে সন্তান প্রতিপালন করেছেন সেদিকে তাকালে দেখা যায় যে, তারা সন্তানের চাহিদা পূরণের ব্যাপারে তেমন একটা সক্রিয় ছিলেন না কিন্তু সন্তানের নিকট হতে তাদের অনেক চাহিদা ও প্রত্যাশা ছিল । মেয়েটির পছন্দ-অপছন্দ এবং ইচ্ছা অনিচ্ছাকে প্রাধান্যতো দিতেনই না বরং তাদের সিদ্ধান্তকে তার উপর চাপিয়ে দিতেন ও শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মেয়েটি কে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কাজে বাধ্য করতেন এবং মতের অমিল হলে তার ইচ্ছাকে জলাঞ্জলী দিতে চাপ প্রয়োগ করতেন। চাপের মুখে পড়ে কিছুদিন বাবা-মার কথা মত চললেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিরও সুযোগ পাবার পর বাবা-মার থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সিদ্ধান্ত নেয়। এ বিচ্ছিন্ন জীবনে সে ভীষণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে এবং একাকীত্ব বোধ করতে থাকে এবং নিজেকে ও নিজের জীবনটাকে মূল্যহীন মনে হতে থাকে এবং চরম বিষন্নতায় ভুগতে থাকে।

> নৈতিকতার বিকাশ যথাযথভাবে না হওয়ার কারনে ও ভাল-মন্দের মধ্যে বিভেদ করতে পারে না বলে চরম সিদ্ধান্তহীনতায় সে ভুগতে থাকে

ব্যাখ্যা ঃ উপরের উদাহরণ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, অভিভাবকেরা যদি সন্তানের প্রয়োজন বা চাহিদা পূরণের ব্যাপারে যদি আদর- ভালবাসার সম্পর্ক তৈরীর ব্যাপারে সক্রিয় না হয়ে শুধু বিভিন্ন চাহিদা আরোপ করতে থাকেন এবং তাদের আরোপিত নিয়মনীতি, মূল্যবোধ, মতামতের উপর তাদের আনুগত্য প্রত্যাশা করতে থাকেন ও মূল্য দিতে থাকেন এবং অন্যথায় কঠোর শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সন্তানকে নিয়ন্ত্রনে রাখতে সচেষ্ট থাকেন তবে তার নেতিবাচক প্রভাব সন্তানের উপর পড়তে পারে । তার বিকাশ ঠিক মত হয় না বরঞ্চ প্রচন্ড জোরাজোরির কারনে সে হয়ে উঠতে পারে এক লাজুক ও সামাজিক ভাবে এক অক্ষম ব্যক্তি। নৈতিকতার বিকাশ যথাযথভাবে না হওয়ার কারণে ও ভাল-মন্দের মধ্যে বিভেদ করতে পারে না বলে চরম সিদ্ধান্তহীনতায় সে ভুগতে থাকে।

উপরের আলোচিত ঘটনা গুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আদর, ভালোবাসা, প্রত্যাশা, স্বাধীনতা, শাসন বা নিয়ন্ত্রণের মাত্রার অতিরিক্ততা বা ঘাটতি উভয়ই সন্তানের বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে । অতএব এ ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারলে তা সন্তানের বিকাশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এক্ষেত্রে শিশুর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বা গুনাবলী, চাহিদা, আবেগ, মতামত এবং মূল্যবোধগুলোকে অবহেলা বা কটাক্ষ না করে সেগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারলে উপকার পাওয়া যেতে পারে। কোন সিদ্ধান্ত জোর করে চাপিয়ে দেয়ার পরিবর্তে আলাপ আলোচনায় যুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে অগ্রসর হতে পারেন । সন্তান যাতে যথাযথ আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মবিশ্বাস এবং সমাজে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় মানবীয় গুনাবলী ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ভাবে সুস্থতা বজায় রাখতে পারে মা-বাবা ও অন্যান্য অভিভাবকদের সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করাটা জরুরী।

সাইফুন্নেসা জামান, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী, কাউন্সেলর, ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শদান দপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়